আফিম

রামচন্দ্র প্রামাণিক

(সময় : ২০ রজব ১০৭৯ হিজরি; ৪ ডিসেম্বর ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

বাইরে কুয়াশা সরিয়ে আলো ফুটছে একটু একটু। গাছে গাছে শুরু হয়েছে সদ্য ঘুমভাঙা পাখিদের কলরব। হঠাৎ সেসব ছাপিয়ে শোনা গেল কারও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর— বাইরের রাস্তায়।

মল্লিকা উঠে সন্তর্পণে জানলার একটা পাল্লা খুলতেই মুখে যেন সজোরে আঁচড়ে দিল কনকনে হাওয়া। তাড়াতাড়ি সে ফের বন্ধ করল পাল্লাটা।

ওই শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল মন্দার। চোখ জ্বালা করছে। তারা দু-জনেই দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি অনেক রাত পর্যন্ত। পারেনি বোধহয় এ তল্লাটের অনেকেই।

কী হল? মন্দা জিজ্ঞেস করল।

একটা লোক। বোধহয় গিলেছে, এই সাত সকালেই। মল্লিকা বলল।

মন্দা উঠে জানলার পাল্লাটা খুলে বাইরে তাকাল। এক ঝাঁক বরফ যেন পাখা ঝাপটে ঢুকে পড়ল প্রায়ান্ধকার ঘরে। কেঁপে উঠল দু-জনেই।

দেখল অদূরে রাস্তার মোড়ে একটি অল্পবয়সি তরুণ কিছু বলছে উত্তেজিত গলায়। সামনে দাঁড়িয়ে শুনছে জনা তিনেক লোক।

মন্দা বলল, তুই তো সব কিছুতেই নেশা দেখিস। ও নিশ্চয়ই ফৌজদারের কথা বলছে। কিছু খবর পেয়েছে হয়তো।

পুরো গাঁ এখন আতঙ্কে হিম হয়ে আছে। পুরুষরা কেউ কাজে বেরোয়নি। চাষি বেরোয়নি হাল কাঁধে, রাখাল বেরোয়নি গোরু নিয়ে। কাজে ব্যস্ত একা শুধু গাঁয়ের কর্মকার। রাত্রি-দিন হাপর টেনে তৈরি করছে তরোয়াল, বর্শা, তিরের ফলা। ধার শানাচ্ছে পুরোনো হাতিয়ারে। তাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোয়ান ছেলের দল— যার যার নিজের অস্ত্রটি তুলে নেওয়ার অপেক্ষায়।

এই গাঁ-টি অবশ্য ছোটো— আড়ে এবং বহরে, মানে শরীরে এবং ওজনে। অধিকাংশই খেটে খাওয়া গরিব মানুষ। বড়োলোক— রইস আদমিরা রয়েছে সব কাছে-দূরের বনেদি গাঁগুলোয়— রেওয়ারা, চন্দ্রখাঁ, সরখুদে। সেখানে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড়ো বড়ো হাভেলি। গোয়ালে শুধু গোরু-মোষ নয়, আস্তাবলে রয়েছে ঘোড়া এবং উঠোনে বাঁধা উটও। একটি করে হাতিও রয়েছে দু-টি গাঁয়ে।

জানলার পাল্লা লাগিয়ে মুখ ভার করে বসে পড়ল মন্দা। শেষ রাতে একটু ঘুম এসেছিল চোখে। কিন্তু দুর্ভাবনার ঘুম ছেঁড়া ছেঁড়া। রাগ করে বলল, তুই নিজেও ঘুমুবিনে, অন্যকেও ঘুমুতে দিবিনে।

মন্দার দোষ নেই। মল্লিকার ওই এক বাতিক। এ গাঁয়ের সব নির্বিরোধী ভালোমানুষ, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। তবু যত্রতত্র সে নেশার সন্ধান পায়, দেখতে পায় নেশাড়ুকেও। ছেলেবেলাটা তার কেটেছিল গোয়ালিয়র দুর্গে। তার বাপ ছিল ওখানকার কিল্লাদারের পেশকার। খেরাজ (কর) আদায়ের ফর্দ বানাত, খরচাপাতির হিসেব রাখত, চিঠি-চাপাটি যা পাঠাতে হবে সদরে তার মুসাবিদা করত। মক্তবে বাচ্চারা আরবি শেখে। সেখানে হিন্দুস্থানি তো পড়ানো হয় না। খানদানি ঘরের মুসলমান ছেলেমেয়েরা পড়তে চায়ও না এদেশি আওয়ারা-আতরাফের ভাষা। তবে হিন্দুস্থানি জানা থাকলে সাধারণ মুসলমানের কামকারবারে সুবিধে হয়। কারবারের সিংহভাগ তো কাফেরদের সঙ্গে। মল্লিকার বাপজান তাই তাদের শেখাত নাগরি হরফ লেখা এবং পড়াও।

ঘরে এখনও অন্ধকার। কেউ কারও মুখ দেখতে পারছে না ভালো করে। বাড়ির অন্দরে মৃদু কথাবার্তা শোনা গেল। তার মানে অন্যরাও উঠে পড়েছে। এ পাড়ায় এই একটিই শক্তপোক্ত কোঠাবাড়ি। তাদের পড়শি কয়েকটি জোয়ানি আওরত রাতে এসে এখানেই আশ্রয় নেয়। কখন কী হয়, বলা তো যায় না। পুরুষরা তৈরি রেখেছে কর্মকারের তৈরি হাতিয়ার, ছাদে জমা করেছে ছুড়ে মারার মতো পাথর এবং ইট। মেয়েরা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে মাটির ভাঁড় ভর্তি করেছে, রেখেছে শুকনো বালিও। সেও ছুড়ে মারার জন্য। দুশমনের চোখে।

মল্লিকার আসল নাম শুধু এ বাড়ির ক-জন ছাড়া আর কেউ জানে না। তাকে ঠিক ভাবে কথা কইতে তালিম দেয় মন্দা। সে একদিন বলছিল দারা শুকোহ-র পুত্র সোলেমান শুকোহ-র কথা। আট-ন বছর আগে, মল্লিকা যখন এই এতটুকু তখনও পুতুল খেলে। এক বিকেল বেলায় সেই বন্দি যুবাপুরুষকে নিয়ে এল গোয়ালিয়র কেল্লার মধ্যে। শান-দেওয়া তরোয়ালের মতো চেহারা। কী তার রূপ! যেন সুয্যি ঠাকুর নেমে এসেছেন আশমান থেকে। মন্দা মুখে চুকচুক শব্দ করে হেসে বলল, তুই ঠিক ডোবাবি সবাইকে। আশমান নয় রে, আকাশ।

হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল মল্লিকার। ভয়ে এবং দুর্ভাবনায় কারও গলা দিয়ে খাবার নামছে না ইদানীং। কাল রাতে তো তারা দু-জনে মুখে কিছু না দিয়েই শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ পেট চোঁ চোঁ করে উঠল তার। ওম-এরও হরবখত এমন খিদে পায়। তাই ঘরের কুলুঙ্গিতে সবসময় রাখা থাকে দাদির বানানো নাড়ু-ভর্তি ডিব্বা। বলা নেই কওয়া নেই মুখে ফেলবে। আরামে চিবুতে চিবুতে বলবে— কেন যে কৃষ্ণ ঠাকুর নাড়ু এত পছন্দ করতেন তা এখন বেশ বুঝতে পারি। নাড়ু যে খুবই সুস্বাদু তা মানে মল্লিকাও।

এ বারের গোলমালের গোড়ায় ওই কৃষ্ণ ঠাকুরই। মল্লিকা অষ্টপ্রহর আকুল হয়ে প্রার্থনা করে মনে মনে— দোয়া করো আল্লা রহমান, দয়া করো। রক্ষা করো খোদাতালা। রক্ষা করো হে কৃষ্ণ ঠাকুর। নিরাপদে রাখো আমার মানুষটাকে।

তার কথাও শুনল না ওম! সে অষ্টপ্রহর ভাবে। হায় আল্লা! কোথায় যাবে মল্লিকা? ইয়ার-দোস্তদের কথাই বড়ো হল! এমন রোখ যে ধরবে তার মাসুম মানুষটাকেও তা কখনো ভাবতে পেরেছিল সে?

ডিব্বা থেকে নাড়ু বের করে নিজে দু-টি নিয়ে বাকি দু-টি দিল মন্দাকে। মন্দা হাতে নিয়ে মুখে পুরে দিল একটা তারপরেই তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বের করে ফেলল।

এ বাড়িতে কেউ বাসি কাপড়ে এবং স্নান না করে কিছু মুখে দেয় না, জানে মল্লিকা। তবে মন্দা মানে না অতশত। অন্তত মল্লিকার কাছে তো মানেই না। কিন্তু না, যা ভেবেছে তা নয়, মন্দা ম্লান মুখে বলল, তুই একা খা ভাই, আজ আমার একাদশী।

ওম-এর ঠিক ওপরের দিদি মন্দা। সাদা কাপড় পরে, খালি হাতে-গলায় থাকে। বিধবাদের তো গহনা পরতে নেই। তবু দেখায় যেন সুরতওয়ালি শাহজাদি। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। একদিন মল্লিকা ননদকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি যদি মরদ হতাম দিদি, তোমাকে নিয়ে ঠিক ভেগে যেতাম।

মন্দা বলে, দুর মুখপুড়ি। মরদ নয়, পুরুষ মানুষ। ভেগে যেতাম নয়, পালিয়ে যেতাম। তা বোকা মেয়ে! তুই যে আমার থেকে বয়সে ছোটো। কী করতিস আমাকে নিয়ে?

মল্লিকা মুখ ভার করে বলে, তাতে কী হয়েছে? পয়গম্বর নবির থেকে হজরত খাদিজা বিবি বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন, তা জানো? মিঞা-বিবি হিসেবে তাঁরা দু-জনে ছিলেন খুব খুশি। কী যেন তুমি বললে সেদিন— সুখী দম্পতি।

মল্লিকা একদিন বলেছিল, আচ্ছা দিদি, এই যে তুমি এত কষ্ট করছ, একাদশী করছ, কত দিন উপোস করে থাকছ, তা তুমি মরে গেলে কি ঠাকুরজামাইও করতেন এসব?

মন্দা বলে, না রে, এসব শুধু মেয়েদেরই করতে হয়।

মল্লিকা বলে, এই যে তুমি সারাটা জীবন একা একা থাকবে, কী যেন বললে সেদিন ব্রহ্মচারিণী হয়ে, ঠাকুরজামাই বেঁচে থাকলে কি নিজেও এমনটা করতেন তোমার কথা মনে রেখে?

মন্দা আবার হাসে তার ম্লান হাসি। বলে, কবে সাতপাক ঘুরিয়ে আর একটাকে ঘরে এনে তুলত। মল্লিকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে খোলসা করার জন্য বলে, বুঝলিনে? বিয়ে করত রে, বিয়ে করত।

মল্লিকা তখন বলল, জানো দিদি, হজরত খাদিজা বিবিও কিন্তু বিধবা ছিলেন।

মন্দা তাড়াতাড়ি স্নান করে নিল। নিল মল্লিকাও। তার ভিজে চুলে কাঠের কাঁকুই চালিয়ে জট ছাড়িয়ে দিল মন্দা। বলল, পিঠে ছড়িয়ে রাখ, শুকিয়ে যাবে এক্ষুনি। তার

নিজের চুল তো ছোটো করে ছাঁটা। তাই শুকোনোর বালাই নেই। গৃহদেবতার সামনে একটা পেন্নাম ঠুকেই বলল, চল। মন্দার মা গলা তুলে বললেন, আজকের দিনেও তোমাদের না বেরুলে চলছিল না?

তারা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল গাঁয়ের কৃষ্ণ মন্দিরের দিকে। সামান্যই পথ। কিন্তু আজ মানুষ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। স্বামী-পুত্রের মঙ্গল-কামনায় মেয়েরা যাচ্ছে ত্রস্ত ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝেই, মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করছে, 'গোবিন্দ, গোবিন্দ'। মন্দিরে যাওয়া মন্দার রোজকার কাজ। একাই যায়। আজ মল্লিকাকে নিয়েছে সঙ্গে।

বেশ ভিড়। আরও আগে এলে ভালো হত। মন্দা ঘুম থেকে ওঠে কোন কাকভোরে। কিন্তু ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলেই একটু দেরিতে। বামুন-পুরুতরা ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ করান, আচমন করান, রাত্রির শয্যা তোলেন। তারপর বেশবাস পরানো। সেসব সাঙ্গ হলে তবে ভক্তদের দর্শন দেন ঠাকুর। মল্লিকা শুনে বলেছিল, ও দিদি, ও তো পাথরের পুতুল। তার কি হুঁশ আছে? তাহলে তাকে ঘুম পাড়াবেই-বা কী করে আর ঘুম ভাঙাবেই-বা কী করে? আবার বলো, দুপুরে ভোগ দেওয়ার সময় গর্ভ মন্দির খালি করে দিতে হয় যাতে তিনি নির্বিঘ্নে খেতে পারেন, কী পাগলামো তোমাদের! বুদ্ধিশক্তি কি লোপ পেয়েছে সক্কলের? কেল্লার পানি-খাওয়া কয়েদিদের মতো?

মন্দা বলে, চুপ, চুপ। মা শুনতে পেলে তোকে এ-বাড়ির পাট চুকোতে হবে আজকেই। তারপর হেসে বলল, শুধু কি তাই? শুনেছি পুরুষোত্তম জগন্নাথ বছরে এক হপ্তা করে অসুখেও ভোগেন। তখন নাকি তাঁর কম্প দিয়ে জ্বরও আসে। তোর যেমন ক-দিন হল গত মাসে, ওমকে তোর কাছে শুতে দিল না মা।

মন্দিরে পৌঁছে মন্দা তাকে দাঁড়াতে বলল দরজার বাইরে, গর্ভগৃহের মুখোমুখি। বলল, এখান থেকে দেখ আর হাত জোড় করে কাঁদাকাটা কর। কেউ ভেতরে ঢুকিসনি কেন জিজ্ঞেস করলে বলবি, শরীর খারাপ।

মল্লিকা জানে তার মন্দিরে ঢোকা বারণ। বাড়িতেও। ওম যেদিন তাকে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে সেদিন সবার ক্রুদ্ধ ভাবভঙ্গি দেখে সে বুঝতে পেরেছিল কীরকম আপ্যায়ন এখানে অপেক্ষা করছে। বলা ভুল হল, যতটা না ক্রুদ্ধ তার থেকে বেশি ত্রস্ত, ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত ছিল সব্বাই।

কারণটাও সে বুঝতে পারে দিব্যি। এখন হিন্দুস্থানের বাদশা আবুল জাফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজীব আলমগির গাজি। তিনি বাদশা হওয়ার পর পরই বদলে গেল সব কিছু। হিন্দুরা ভয়ে তালপাতার মতো কাঁপছে। এবং ফুঁসছে নিষ্ফল ক্রোধে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এদিকে-ওদিকে, কখনো-সখনো। যেমন ঘটেছে এবার। তিলপটে।

মল্লিকার বাপের ঘর এখন মথুরায়। তার আব্বাজানের নোকরি ছিল গোয়ালিয়রের কেল্লায় কিল্লাদার মুয়াতামাদ খান-এর তাঁবে। কিন্তু খান সাহেবের এক ভাতিজা এসে

পেশকার হিসেবে যোগ দিলে মল্লিকার বাপ এনায়েত মিঞা রাতারাতি বেকার হয়ে পড়লেন, তখন কিল্লাদার তাঁর হাতে খত লিখে পাঠিয়ে দিলেন মথুরায়। এখানে তিনি যোগ দিলেন ফৌজদারের দপ্তরে। গত বছর তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। এখন খালাম্মা দেখভাল করে তাদের।

সেই গোয়ালিয়র দুর্গের শৈশবস্মৃতি রয়ে গেছে তার মনে। সে জানে নেশাড়ুকে কেমন দেখায় প্রথমে, তারপর ধীরে ধীরে সেই নেশা কেমন পেয়ে বসে তাকে। এবং কীভাবে বদলে যায় তার চেহারাখানা। সেসব ভাবতেই একটা দুরন্ত ভয়ের অনুভূতি তার শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে যেন উপরের দিকে উঠতে থাকে।

প্রথম যেদিন এল এই বাড়িতে— কী অবস্থা তার! ওম তাকে দিয়েছিল একখানা শাড়ি। ভাগ্যিস সে শাড়ি পরতে শিখেছিল মহল্লার সহেলির কাছে। তাই পরে নিয়েছিল শালোয়ার কামিজের ওপর। ওমের বাড়িতে কেউ তো কিছু জানত না। তাকে দেখে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল একেবারে। মাথায় ভেঙে পড়ল যেন পুরো আকাশখানা, ওম-তো হিরের টুকরো ছেলে। সেই কিনা ফুঁসলে বের করে এনেছে একটা মেয়েকে! তাও মুসলমানের মেয়ে! এমন ছেলেকে আঁতুড়েই কেন মুখে নুন টিপে জানে মেরে দেয়নি তার মা?

সেই রাতেই খবর দেওয়া হল গাঁয়ের মাথা রঘুনাথ সিংকে। তিনি কিন্তু সামলে দিলেন সব কিছু। বললেন, পুরুষের মতন পুরুষ আমাদের এই ওম প্রকাশ গুপ্তা। মুসলমানরা হামেশা মেয়ে তুলে নিয়ে যায় আমাদের ঘর থেকে। আমরা শুধু দেখি আর কপাল চাপড়াই। ও কিন্তু বাহাদুর ছেলে, মুসলমানের মেয়ে তুলে এনেছে। নজরও খুব ভালো ওর। এ তো একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা। সুন্দরী মেয়ের জন্য 'লক্ষ্মী প্রতিমা' একটা ভালো বিশেষণ— মল্লিকা জানে।

তিনিই করে দিলেন সব। তার আসল নাম 'মালিকাবানু' থেকে বদলে হল 'মল্লিকা'। গৃহদেবতার সামনে মালাবদল করে তাদের বিয়ে হল। গান্ধর্ববিবাহও শাস্ত্রমতে সিদ্ধ— তিনি বললেন। তার গলায় নিজের হার পরিয়ে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে আশীর্বাদ করলেন শাশুড়ি। সে পা ছুঁয়ে কদমবুশি করল প্রথমে রঘুনাথজিকে তার পর আর সবাইকে। সবই হল প্রায় নিঃশব্দে। তার মুসলমানি পোশাক পুড়িয়ে ফেলা হল সেই রাতেই। তিনি পই পই করে সাবধান করে দিলেন— কাকপক্ষীও যেন কিছু জানতে না পারে। তাহলে ওর জাত ভাইরা নালিশ করবে ফৌজদারের কাছে। মুসলমান ফৌজ হানা দেবে গ্রামে, কারও আর বাঁচার উপায় থাকবে না। খুব সাবধান।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে মল্লিকা। সম্রাট শাজাহানের বড়ো মেয়ে শাহজাদি জাহানারার আশনাই ছিল এক হিন্দু রাজপুতের সঙ্গে। সারা আগ্রা শহর জানে সেই কিস্‌সা। কিন্তু শাদি করতে পারেননি তাঁকে। হিম্মত হয়নি করার। কলকাঠি নেড়ে বাগড়া দিচ্ছিল অনেকেই। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নাকি এখনকার বাদশা আওরঙ্গজীব। তাহলে রঘুনাথজি যে ভয় পাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

আসলে আজকের এই ভয়ের পরিবেশ ততদিনে জাঁকিয়ে বসেছে চারদিকে। ওম-এর মা-বাবা তাই ছেলেকে গলা তুলে বকাবকি পর্যন্ত করতে পারলেন না। তার প্রাণসংশয় হবে তাহলে। শুধু তীব্র দৃষ্টি দিয়ে দহন করতে লাগলেন মল্লিকাকে। একমাত্র মন্দাই আপন করে নিল ওই অনাহূত ভ্রাতৃবধূকে। সেই এখন মল্লিকার একমাত্র আশ্রয়— বিশেষত যখন ওম চলে গেছে এলাকার অন্য যুবকদের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে।

মল্লিকা বলেছিল, তুমি লড়াইয়ের জানোটা কী? ওম বলেছিল, তবু যেতে হবে। কোনো জোয়ান ছেলে বাড়িতে বসে থাকবে না। কত কাজ রয়েছে সেখানে। কোনো-না-কোনো কাজে লেগে যাব ঠিক। ওম তার কান্নাকাটি মানবে না! ভাবতে পেরেছিল সে?

মল্লিকা ভাবে সেই প্রথম দিনগুলোর কথা। ওম যেত মথুরায় মামার বাড়িতে। বানিয়া তো। মামার ছিল কাপড়ের ব্যাবসা। বাজারে তাঁর দোকানের পাশেই ছিল তার খালার দোকান। অল্প বয়সে খালাতো ভাইবোনদের সঙ্গে সেই দোকানে প্রথম দেখে ওমকে। তারপর দেখা হতে লাগল আলি পিরের দরগায়।

মল্লিকা মাঝে মাঝেই মন্দাকে বলত গোয়ালিয়র কেল্লার কথা। বলত কীভাবে বাদশার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সেখানে আটক রেখে পোস্তাপানি খাওয়ায়।

মন্দা জিজ্ঞেস করেছিল, পোস্তাপানি কী?

মল্লিকা বলে, আফিমের ফলের খোসা বেটে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখে। সকালবেলা সেই জল ছেঁকে নিয়ে বড়ো বাটি ভর্তি করে খেতে দেয় কেল্লার রাজবন্দিকে। ওই পানিই সর্বনাশ করবে মানুষটার।

মন্দা বলে, যাকে দিচ্ছে সে তো জানে কী বস্তু সেটি। না খেলেই হল। জোর করে তো খাওয়ানো যায় না। খাওয়ালেও বমি করে তুলে ফেলবে। সেটা আটকাবে কী করে?

মল্লিকা বলে, অত সহজ নয় ব্যাপারটা। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আফিমের সরবত— মানে পোস্তাপানি— পুরোটা না খাচ্ছে ততক্ষণ অন্য কিছু জুটবে না, না খাওয়ার না পান করার। থাকো না খেয়ে কতদিন পারো। বমি করে তুলে ফেললে আবার দেবে। যখন বুঝবে পেটে তলিয়েছে, হজম হয়ে গেছে, আর উঠে আসবে না বমির সঙ্গে, তখনই শুধু অন্য খাবার দেবে। বোঝা এবার কাণ্ডটা।

মল্লিকা আরও বলে, জানো শরিয়ত বিরোধী ইসলাম-নিষিদ্ধ কাজকর্ম সব বন্ধ করে দিয়েছেন এই বাদশা। শরাবখানা বন্ধ, কসবিদের ডেরা বন্ধ, দরবারে গানবাজনাও বন্ধ। আফিমের চাষ কিন্তু বন্ধ হয়নি। গোয়ালিয়র কেল্লায় দরকার পড়বে যে।

মন্দা হাঁ হয়ে যায় শুনে।

মল্লিকার সঙ্গে ওম-এর হামেশা দেখা হয়ে যেত আলি পিরের দরগায়। পিরবাবার বড়ো ভক্ত হয়ে উঠেছিল ছেলেটা। অবশ্য পরে জেনেছে মল্লিকার জন্যই যেত সে। তা একদিন তার হাতে একটা লম্বা কাপড়মোড়া জিনিস দেখে মল্লিকা জিজ্ঞেস করেছিল,

ওটা কী? ওম বলল, তুষে লেখা এটা; হিন্দুস্থানি পুঁথি। এদেশি কাফেররা কাগজে লিখতে চায় না। বলে তা ম্লেচ্ছদের জিনিস, লেখা নাকি অপবিত্র হয়ে যাবে। আহাম্মকের দল জানে না যে কাগজ চীন দেশের জিনিস। ক-জন চীনা যুদ্ধবন্দি প্রথম কাগজ তৈরি করে দেখিয়েছিল সমরখন্দে। তখন থেকে মুসলমানদের দেশে কাগজ তৈরি এবং ব্যবহার হচ্ছে। তাতে কত সুবিধে! কিন্তু হিন্দুরা এখনও সরু সরু ভূর্জপত্রে লিখে কাঠের পাটা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে। তাকেই বলে তুষ।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, কী পুঁথি?

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে ওম লাল কাপড় খুলে দেখিয়েছিল। কাঠের পাটার ওপরে লেখা *শ্রীরামচরিতমানস*। সে পড়তে পারল দেখে ওমের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কে জানে সেদিনই হয়তো শুরু।

বাদশার কাছে মথুরা নগরীর গুরুত্ব অপরিসীম। দিল্লি থেকে আগ্রা যাওয়ার রাজপথ গিয়েছে যে ওই মথুরার ওপর দিয়ে। আব্দুল নবি খান এলেন মথুরার ফৌজদার হয়ে। এছাড়াও আছেন মুতাসিব— ধর্মীয় ব্যাপারে নীতিরক্ষার হর্তাকর্তা— প্রতিটি নগরীর জন্য। বাদশা নাকি ফৌজদারকে হুকুম দিয়েছেন মূর্তিপুজোর মূলোচ্ছেদ করার জন্য। নতুন ফৌজদার খুব ধার্মিক মানুষ, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন। তিনি চটজলদি হুকুম তামিল করা শুরু করলেন। প্রথমেই বেছে নিলেন মথুরা নগরীর মাঝখানের একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দিরকে। সেটি পুরো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর দেখতে দেখতে সেখানে গড়ে উঠল বিশাল দেখনদার জুম্মা মসজিদ।

ওটা তো ভেঙেই পড়ছিল প্রায়, সেই ভাঙাটা ফৌজদার সম্পূর্ণ করেছেন মাত্র। তাই হিন্দুরা বিশেষ আমল দিল না। এবার ফৌজদার খবর পাঠালেন— মথুরার কেশব দেব-এর মন্দিরে রয়েছে একটি অপরূপ খাঁজকাটা শ্বেতপাথরের রেলিং যেটি উপহার দিয়েছিলেন শাহজাদা দারা শিকোহ। বাদশার হুকুমে সেটিও ভেঙে দেওয়া হল। এটা তো ভাইয়ে ভাইয়ে রেষারেষির ব্যাপার— এই ভেবে হিন্দুরা খানিক সান্ত্বনা পেল।

ইতোমধ্যে খবর এল— আগ্রা কেল্লার ফটক হাতিপুল-এ প্রবেশদ্বারের দু-পাশে বসানো ছিল যে দু-টি অপূর্ব পাথরের হাতি, ইসলাম-নিষিদ্ধ বলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু আমির-মনসবদাররা বলল, মালিক তাঁর নিজের খাসি কোতল করবেন না জবাই করবেন এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এতে অন্যদের কী বলার থাকতে পারে?

ঠিক এই কথাই মল্লিকা বলেছিল ওমকে যখন তার পায়ে চপ্পল দেখে সে বলেছিল, তোমরা তো দেখছি পায়ে জুতো পরো।

মল্লিকা মুখঝামটা দিয়ে বলেছিল, পায়ের মালিকই ঠিক করবে সে জুতো পরবে না খালি পায়ে হাঁটবে। কথাটা ওমের লেগেছিল খুব। তার ব্যথিত মুখ দেখে মল্লিকা তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, ঠিক আছে। আমি না হয় খালি পায়েই থাকব।

এখন ভাবলে অবাক হয় সে। সেদিনই কি বলা হয়ে গিয়েছিল যা বলার? সেদিনই কি ওম বুঝেছিল যা বুঝবার?

মথুরার মানুষ কিন্তু খুব বেশি দিন মুখ গুঁজে থাকতে পারল না বালিতে। উদ্বেগ আর অশান্তি বেড়েই চলল। তারা শুনেছে বাদশা খুব বিরক্ত হিন্দু-ব্রাহ্মণদের টোল আর পাঠশালার ওপর যেখানে হিন্দু-মুসলমান দু-তরফই যায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য। তিনি দিকে দিকে ফরমান পাঠিয়েছেন যাতে ওই ভ্রান্ত শিক্ষার কাফেরি প্রতিষ্ঠানগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত মন্দির নির্বিচারে ধ্বংস করার নির্দেশও দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন হিন্দুদের তীর্থস্থানের ধর্মীয় মেলা নিষিদ্ধ করারও। এবং তা পালনে মুতাসিবদের উৎসাহেরও অভাব নেই।

মথুরায় তখন খুব উত্তেজনা। হিন্দুরা যখন কথা বলে তখন মুসলমান প্রতিবেশী এলে চুপ হয়ে যায়। মুসলমানরা তো সংখ্যায় কম। তারাও সাবধানি। আলাপ-আলোচনার সময়ে হিন্দু পাড়শিকে আসতে দেখলে কথা ঘুরিয়ে আগডুম বাগডুম গল্প করে। আলি পিরের দরগা মুসলমান মহল্লার লাগোয়া। হিন্দুরা আজকাল ওদিকটা এড়িয়ে চলে। কিন্তু ওম যায়। সেদিন তাকে পেয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, তা আমি না হয় খালি পায়ে থাকলাম। কিন্তু আমার এই সুন্দর চপ্পল-জোড়াটার কী হবে?

ওম-এর সাহস বেড়ে গেছে ততদিনে। সে বলল, আমাকে দিয়ো।

কী করবে তুমি নিয়ে?

ওর ধুলো দিয়ে চোখের সুরমা বানাব, আর চটিজোড়াটা দিয়ে বানাব মাথার বালিশ।

বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল মল্লিকার। ছুটে প্রায় পালিয়ে গিয়েছিল সে।

ওমের মামুর দোকানের পাশেই ওর খালার দোকান। সেখানে বসে খালাতো ভাই ফরজম। ওমের সমবয়সি, দোস্তই একরকম। সে একদিন বলল, হাসতে হাসতেই বলল, একটা মুসলমানের লড়কি দেখে শাদি কর।

বুকের রক্ত চলকে উঠেছিল ওমের। কেন বলল এমন কথা? কিন্তু না, কিছু বোঝেনি বোধহয়। এমনিই বলেছে, মজা করে। মনের ভাব চেপে ওম বলল, কেন?

খুবসুরত বিবি পাবি— ফরজম বলে। তোদের হিন্দু লড়কিরা হয় বদসুরত, বিশ্রী দেখতে, নইলে আনপড় বেতরিবত। তাছাড়া মুসলমান হলে সরকার থেকে ইনাম পাবি, মাসোহারা পাবি, পড়ালিখা জানিস, চাইলে সরকারি নোকরি ভি পেয়ে যাবি, এছাড়া ব্যাবসা করলে নিজের নামে করতে পারবি, মাশুল দিতে হবে না।

ওম জানে ভিতরের রহস্যটা। তার মামুর দোকানের সামনে ঝোলানো নাগরি হরফে লেখা সাইনবোর্ডটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন ফার্সিতে লেখা ফরজমের বাপের নাম। হিন্দু ব্যবসায়ীদের মোট বিক্রিত পণ্যের শতকরা পাঁচ ভাগ মাশুল দিতে হয়। বাদশা আলমগির মুসলমানদের মাশুল মকুব করে দিয়েছেন। হিন্দুরা অনেকে তাই মুসলমানের নামে ব্যাবসা করে, সরকারকে ফাঁকি দেবার জন্য।

সেদিনই বিকেলে দরগার সামনে দাঁড়িয়ে ওম ওই কথা বলছিল। মজা করে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, ধর্ম বদলালে অনেক সুবিধে।

ফোঁস করে উঠল মল্লিকা। কেন? মরদ মানুষ কেন ধর্ম বদলাবে? এত যে রাজপুত মর্দানি জাঠ জোয়ানি এসেছে দিল্লি আগ্রার হারেমে বধূ হিসেবে, সবাইতো খসমের ধর্মই গ্রহণ করেছে। এইতো কিছুদিন আগেই রাজা রূপ সিং রাঠোরের মেয়েকে শাদি করলেন শাহজাদা মুয়াজ্জম। কে ধর্ম বদলাল এখানে? মিঞা না বিবি?

ছোটোখাটো মন্দির ভাঙা তো চলছিলই। এখন আর কেউ তেমন আশ্চর্য হয় না। আগের বাদশা সম্রাট আকবর ছিলেন প্রজানুরঞ্জক রামের মতো। সবাই সমান ছিল তাঁর চোখে। মোটামুটি একই ধারা বজায় ছিল বর্তমান বাদশার বাপ শাজাহান অবধি। এখন সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। হিন্দুদের তাই বিলাপ করাই সার।

মানুষ মেনেই নিয়েছে। না মেনে উপায় কী? বাদশা আওরঙ্গজীব যখন ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা, তখন নাকি আমেদাবাদের নবনির্মিত চিন্তামন মন্দিরে গোরু জবাই করেছিলেন। হতভম্ব ও আতঙ্কিত লোকজন যখন অশুচি-অপবিত্র মন্দির ছেড়ে পালাল, তখন তিনি সেটাকে রূপান্তরিত করলেন মসজিদে। তারপর সেই প্রদেশে তাঁর হুকুমে অজস্র ছোটোবড়ো মন্দির গুঁড়িয়ে গিয়েছে। বড়োভাই যুবরাজ দারার বিরোধিতা এবং বাদশা শাজাহানের তিরস্কারও তাঁকে দমাতে পারেনি।

বাদশাকে যেন এখন নেশায় পেয়েছে— মন্দির ভাঙার নেশা। জানা গেল কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙা পড়েছে। আরও খবর এল সালাহ বাহাদুরকে পাঠানো হয়েছে মালারনার মন্দির ভেঙে দেওয়ার জন্য। সবাই বলছে, এবার লক্ষ্য মথুরায় কেশব দেব-এর মন্দির। এটি প্রাচীন নয় অবশ্য। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন বীর সিং দেও বুন্দেলা তেত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অর্ধশতাব্দীরও আগে। এই বীর সিং দেও-ই সেলিমের (সম্রাট জাহাঙ্গীরের পূর্বনাম) নির্দেশে উদার সুপণ্ডিত সম্রাট সুহৃদ আবুল ফজলকে হত্যা করেছিল। বাদশা আকবর নাকি তিনদিন জলস্পর্শ করেননি সেই শোকে। দু-জনে বলে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই ওই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আরও খবর এল মন্দির ভাঙার পর মথুরা নগরীর নাম বদলে নতুন নাম হবে 'ইসলামাবাদ'।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল, তিলপটের জমিদার জাঠ নেতা গোকলা বিদ্রোহ করলেন। অপ্রস্তুত মোগল বাহিনী কচুকাটা হতে লাগল। মাস ছয়েক আগে— জিল মাসের একুশ তারিখে— ফৌজদার আবদুন নবি খান গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন।

মথুরা শহরের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। নেতৃত্বহীন পুরো মোগল ফৌজ দিশাহারা। কোতোয়ালের সমস্ত লস্কর-বরকন্দাজ তখন শহরের পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তর

দিক রক্ষা করার জন্য মোতায়েন। পূর্ব দিকের জন্য খোদা ভরসা, কারণ যমুনা নদী সেখানে বয়ে যাচ্ছে প্রহরীর মতো।

ওম সেদিন ছিল মামার বাড়িতে। মামা এবং মামাতো ভাইরা বাজারে গেল খবরাখবর নিতে, দোকান পাহারার ব্যবস্থা করতে। ওমও বেরুল, মালিকার খালাম্মা নাকি কোথা থেকে ওর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে। এই হুজ্জোত-হট্টগোলে সেটা বোধহয় মুলতুবি থাকবে। আলবত থাকবে— ওম ভাবে। কী ভেবে সে হাঁটা শুরু করল দরগার দিকে। দূর থেকে দেখল, ঠিক যা ভেবেছিল, দরগার সামনে ত্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মালিকা ফালুক-ফুলুক করে তাকাচ্ছে এদিকে-ওদিকে।

ওম পৌঁছুতে না পৌঁছুতে সে বলল, দেখব আজ তুমি কেমন জোয়ান মরদ।

ওম ভাবল— মালিকা যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলছে তাকে। পাংশু মুখে সে কী বলবে ভেবে পেল না। তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য দৃঢ় স্বরে সে বলল, আজ পথ-ঘাট ফাঁকা, পাহারাদাররা সব শহরের বাইরে। পারবে আমাকে নিয়ে পালাতে?

ওমের হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য।

মল্লিকা বলল, আজই। এমন মওকা আর পাবে না।

ওম তো তো করে বলল, কীভাবে?

মামুর ঘোড়াগুলো কোতোয়ালের লোক কেড়ে নিয়ে গেছে যুদ্ধে লাগবে বলে।

অসহিষ্ণুভাবে মল্লিকা বলল, ঘোড়ায় চড়ে কে যাচ্ছে? ধরা পড়ে যাব রাস্তায়। একটা নৌকো দেখো। যমুনা নদীর দিকে কোনো পাহারা নেই।

সেদিন সন্ধের পরেই কথামতো মাল্লিকা এল দরগার কাছের পোড়ো বাড়িটার সামনে। তার নির্দেশমতো ওম এনেছে ভাবিজির একটা ভালো শাড়ি। ওম লুকিয়ে থাকল গাছের নীচের অন্ধকারে। মল্লিকা পোড়োবাড়িটার আড়ালে গিয়ে পরে এল শাড়িখানা— শালোয়ার-কামিজের ওপর। মাল্লিকার হাত ধরে সে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল যমুনার ঘাটের দিকে যেখানে সে এক ধীবরকে বলে পয়সা দিয়ে নৌকো প্রস্তুত রেখেছে।

মল্লিকা বেরোয় না বিশেষ। পাড়ার সবাই জানে ওমের বউটি বড়ো লাজুক, অমিশুকে, বাইরের লোকের কাছে জড়সড় হয়ে থাকে। বাড়ির লোকেরা অবশ্য তাকে খানিক মেনে নিয়েছে। শুধু পাকশালা আর ঠাকুরঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। আর— তার এঁটো বাসন কেউ ছোঁয় না। মন্দা বলে, কী বুদ্ধি এদের! বাড়ির সবার বুকের নিধিটি যে প্রতিদিন তার মুখ এঁটো করছে তোর মুখে মুখ দিয়ে, তার বেলা!

ওমকে বাদ দিলে মন্দাই তার প্রধান আশ্রয়। সে ভ্রাতৃবধূটিকে আগলে রাখে দু-হাত দিয়ে। বেশ লেখাপড়া জানে মন্দা। মল্লিকাকে বই পড়ে শোনায়, ব্যাখ্যা করে মানে বোঝায়। মল্লিকা কিন্তু পড়ে শোনাতে পারে না, যদিও সে কম জানে না। আরবি বা ফারসির উচ্চারণ শুনলেই বুঝতে পারবে সবাই— আনপড় অশিক্ষিত হলেও।

একদিন গুরুদেব এসেছেন বাড়িতে। সাত্ত্বিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দেখলেই ভক্তি হয়। তিনি তাঁর সঙ্গের নারায়ণ শিলাটিকে যেভাবে সেবা করেন তা দেখার মতো। মানুষ নিজের শিশু সন্তানকেও অতটা করে না।

গুরুদেব পবিত্র কিতাব পড়ে ব্যাখ্যা করছিলেন। হাতজোড় করে শুনছিল সবাই। শুনছিল মল্লিকাও।

পরের দিন গুরুদেব চলে গেলেন। ওম কাজে বেরুলে এবং খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে মল্লিকা বলল, আচ্ছা দিদি, গুরুদেব ওই যে পড়ে শোনালেন, ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, 'ইন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা আমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি।' মনে পড়ছে?

মন্দা বলল, হ্যাঁ। গীতার নবম অধ্যায়।

মল্লিকা বলল, এ তো আমাদের ধর্মে— থুড়ি, মুসলমানদের ধর্মে যা বলছে ঠিক তাই। যদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়, তাহলে শিলার মধ্যে কি করে থাকবেন আল্লাহ্‌তাল্লা? মানে— নারায়ণ?

মন্দা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি অতি সামান্য মেয়েমানুষ রে। তোর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাধ্যি আমার নেই।

আবদুল নবি খান নিহত হলে নতুন ফৌজদার এলেন সাফ শিকান খান। ব্রহ্মদেব শিশোদিয়া এলেন তাঁর সহকারী হিসেবে। সবাই বুঝল, এবার বাদশা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন। হিন্দু সেনাপতিকে পাশে দাঁড় করিয়ে হিন্দু মন্দির ভেঙে দেবেন। কর কী করবি।

ওদিকে তিলপটের গোকলা জাঠ লাগাম ছাড়া হয়ে গেলেন প্রাথমিক সাফল্যের পর। শুরু করলেন লুঠতরাজ— পুরো সদাবাদ পরগনা জুড়ে। কেউ সেখানে রেহাই পেল না। তাঁর যুক্তি মোগলদের মোকাবিলার জন্য ফৌজ লাগবে, ফৌজ গঠনের জন্য দরকার তংখা। তাহলে লুটপাট ছাড়া উপায় কী? হিন্দু রায়তরা তখন খাবি খাচ্ছে। তাদের জন্য জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

ওম বেরিয়ে গেছে দলের সঙ্গে। মল্লিকার সঙ্গে এখন ঘুমোয় ননদ মন্দা। সে একাহারী, পেটপুরে খাবার খায় দিনে মাত্র একবার। আজ রাতে সে খেয়েছে যবের ছাতু, তাও নামমাত্র। মল্লিকা বলল, জানো দিদি, যেসব পুরুষের বউ মরে গেছে তাদের যদি জবরদস্তি বিধবাদের খাবার খাওয়াতে পার অন্তত একটা মাস, তাহলে তারা বুঝতে পারে কতটা গেঁহুতে কত আটা, আধপেটা খেলে কেমন লাগে।

মন্দা হেসে বলল, তা ওরা যদি বুঝতে পারেও, কী মোক্ষ লাভ হবে আমার?

বিধবাদের তাহলে আবার বিয়ে দেবে। শুধু মুসলমান নয়, আমি শুনেছি ইশাই-এর ভক্তরাও খসম মরে গেলে মেয়েদের বিয়ে দেয় আবার। যারা যুদাই, মুশার শিষ্য-শাকরেদ, তারাও শুনেছি স্বামী মরে গেলে মেয়েদের একা ফেলে রাখে না। ইরান-তুরানে যারা আগুনের পুজো করে, তারাও তাই। তাহলে কেন হিন্দুরা করবে এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ?

মন্দা হেসে বলল, তুই কি ভাবিস আবার বিয়ে হলেই বিধবারা ভালো থাকবে? অপয়া স্বামীখাকি বলে তাদের লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে সারাটাজীবন। সবার কাছে।

মল্লিকা বলে, তা কেন? আমাদের এখনকার বাদশা আলমগির তাঁর বড়ো ভাই দারা শিকোহর বিধবা স্ত্রী উদিপুরী বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। আর জান তো— এই বাদশা এমনিতে খুব নীতিবাগিশ, মদ ছোঁন না, কলমা পড়ে বিয়ে করা বিবির বাইরে কোনো রক্ষিতা নেই। মদ ছোঁন না, কোনো বাঁদিকেও বিছানায় ডাকেন না কক্ষনো। সবাই বলে ওই বেগম তাঁর চোখের মণি। ওদিকে হিন্দু রাজা-রাজড়াদের দেখো সম্রাট আকবরের শ্যালক এবং সেনাপতি রাজা মানসিংহ, পাঁচশো স্ত্রী ছিল তাঁর শুধু ছেলেই হয়েছিল আড়াইশোর বেশি।

মন্দা হেসে বলল, ঠিক আছে। তুই ঘুমো এখন। দেখি পরের জন্মে যদি মোসলমানের ঘরে জন্মানো যায়।

মল্লিকা বলে, দারার বীরপুত্র সোলেমান শুকোহ নাকি বাদশাহকে বলেছিলেন, চাচা, যদি আমার মৃত্যুই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আর্জি— আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব কোতল করুন। কিন্তু আমাকে দয়া করে আফিমের পানি খাওয়াবেন না। বাদশা নাকি খোলা দরবারে সবার সামনে পবিত্র কোরানের নামে শপথ করে কথাও দিয়েছিলেন, ভয় নেই। তোমাকে পোস্তাপানি দেওয়া হবে না।

জানো দিদি, সবাই অবাক হয়ে দেখল, সেই ফেরেশতার মতো রূপবান যুবককে পোস্তাপানিই খাওয়ানো হচ্ছে দিনের পর দিন। পুরোটা দিয়ে শেষ না করা অবধি দানাপানি বন্ধ। প্রথম ক-দিন চোখমুখ ঝলমল করে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তারপর গ্রহণ লাগলে যেমন হয়, কালি পড়তে লাগল চাঁদে। মুখের কালি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। আস্তে আস্তে শ্লথ স্থবির হয়ে গেল রুস্তমের মতো সেই মানুষটা। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, হাত-পা কাঁপে, কথা জড়িয়ে যায়। কতটা সময়ে তাকে মেরে ফেলা হবে তার ওপর নির্ভর করে কতটা করে আফিমের জল খাওয়াবে বন্দিকে। সোলেমান শুকোহ মারা যেতে সময় লেগেছিল দেড় বছরেরও কম। আবার বাদশাহর জন্য যারা কম বিপজ্জনক, তারা বেঁচে থাকে দশ-বারো বছরও, নির্জীব হয়ে।

মল্লিকা সব জায়গায় নেশা দেখতে পায়। ওম যখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি, তখন তার মুখ তো স্বাভাবিক লাগল না। মল্লিকা মনে মনে ভাবছিল— ইয়া নাফসি! হায় কী হবে আমার! হে খোদা, হে কৃষ্ণ, কী করে বাঁচাব আমি এই মানুষটাকে?

আজ সকাল থেকেই পাড়ায় উত্তেজনা। বেলা বাড়তে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। শোনা গেল লড়াই হচ্ছিল অনেকটা দূরে জঙ্গল পেরিয়ে একটা মাঠের মধ্যে। এবার বাদশা পাঠিয়েছেন সেনাপতি হোসেন আলি খাঁকে— মথুরার বিদ্রোহী গ্রামগুলোকে শায়েস্তা করতে। সুশিক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মোগলবাহিনী। কতক্ষণ আর গাঁয়ের

অসামরিক খেটে খাওয়া মানুষ লড়বে তাদের সঙ্গে— কর্মকারের তৈরি হাতিয়ার আর লড়াইয়ের নেশামাত্র সম্বল করে? একজন ঘোড়ায় চড়ে খবর এনেছে হিন্দুরা হেরে গেছে। মোগল সৈন্য এগিয়ে আসছে লুটপাট করতে করতে। হত্যা করছে নির্বিচারে, সুন্দরী মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বলাৎকার করছে।

গাঁয়ের গরিবগুরবো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে সদলবলে ছুটল কাছের জঙ্গলের দিকে। কেউ-বা আবার ছুটল যমুনা নদীর কিনারে। বোধহয় সাঁতরে যেতে চায় ওপারে। সম্পন্ন বাড়িগুলোর কর্তারা যুবতী-তরুণী মেয়ে-বউদের বলল পরের গাঁ সরখুদের দিকে ছুটতে। সেখানে রয়েছে দুর্গের মতো বিশাল হাভেলি। পড়ি-মরি করে ছুট লাগাল মন্দা। তাকে দেখে পেছনে পেছনে ছুটল মল্লিকাও।

খুব কম দূর নয়। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়চ্ছে অল্পবয়সি মেয়ে আর বধূরা। কোথায় তা জানে না। অন্যদের দেখাদেখি ছুটছে শুধু সামনের দিকে। ক-বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মন্দা। দু-একবার পড়ে গেল মল্লিকাও। তার বয়স কম, তাই তাগদ বেশি। দূর থেকে দেখা গেল ধোঁয়া উঠছে। বোধহয় দুশমনরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোথাও।

গাঁয়ের ভিতর ঢুকতেই দেখা গেল খোলা তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। লৌহকঠিন মুখে তরবারি তুলে পথ দেখাচ্ছে মেয়েদের, দেখিয়ে দিচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে।

একটা বড়ো হাভেলির সামনে পৌঁছে দেখল একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রধান ফটকে। তার হাতেও তরবারি। উত্তেজিত গলায় বলল, সামনে সিঁড়ি। সবাই ওপরে উঠে যাও।

চারদিকে যেন ঝড় বইছে। আগুনের তাপ রয়েছে বাতাসে। নাকে এসে লাগছে এক তীব্র কটু গন্ধ। মেয়েরা তখনও ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না কী ঘটতে চলেছে সেখানে।

দ্বিতীয় তলের সিঁড়ির মুখেও যোদ্ধার বেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু-জন— একজন বয়স্ক মানুষ এবং অন্যজন জোয়ান মর্দ।

মল্লিকা দেখল প্রৌঢ়টি তার পূর্ব পরিচিত রঘুনাথ সিং, তাদের গাঁয়ের মাতব্বর। তিনি মন্দাকে দেখে নরম গলায় বললেন, যাও মা, সোজা ছাদে উঠে যাও। ওখানে লোক আছে। জয় মা ভবানী!

পিছনে মল্লিকাকে দেখেই উনি থমকে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ওম্-এর বউ না? মল্লিকা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

রঘুনাথ বললেন, শোনো মেয়ে। এ হল যজ্ঞ, বড়ো পবিত্র যজ্ঞ। যবনীর স্পর্শে তো একে আমরা কলুষিত হতে দিতে পারিনে। তুমি ফিরে যাও।

মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। মন্দাদিদি ওপরে উঠে গেছে ভূতগ্রস্তের মতো পিছন পানে না তাকিয়ে। রঘুনাথ সিং আর একবার রুক্ষ গলায় আদেশ করলেন, যাও। তারপর ইঙ্গিত করলেন সঙ্গের লোকটির দিকে। সে তার তলোয়ারের

ধারালো দিকের উলটো দিক দিয়ে মল্লিকার পিঠে সজোরে মারল লাঠির মতো। আর্তনাদ করে কাত হয়ে পড়ল মল্লিকা সিঁড়ির ওপর। তারপর গড়িয়ে চলে গেল নীচে।

কতক্ষণ পড়ে ছিল জানে না। চেতনা এল কয়েকজনের কথাবার্তায়। তারা বলছে, মনে হচ্ছে এই বাড়ির পেছনেই সবাই মরেছে জহর করে। নীচে চিতা জ্বালিয়েছিল। ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে মেয়েরা।

হঠাৎই বাড়ির মধ্য থেকে গুলতি-ছোঁড়া প্রস্তরখণ্ডের মতো বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক উদ্যত তরবারি হাতে। মাটিতে পড়ে থাকা মল্লিকার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে 'রাম রাম' রণধ্বনি দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সৈন্য ক-টির ওপর। তাদের মুখে তখন যেন এক আশ্চর্য আলো, চোখে জ্বলছে আগুন। ফৌজদারের সৈন্যরা হকচকিয়ে গেল। পরমুহূর্তে তাদেরও রণহুংকার। অর্ধচেতন মল্লিকা বেশ বুঝতে পারল উন্মত্ত কুত্তার মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লড়াই করছে নেশায় বুঁদ দু-দল মানুষ। মল্লিকা তার ঘোরের মধ্যেও ভাবছিল, সেদিন ওম যখন বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, সে যেন তার মুখেও স্পষ্ট দেখেছে কিছুর ছাপ যাকে সে ভয় পায় সব থেকে বেশি। তার তো জানতে বাকি নেই ইনসানের কতটা সর্বনাশ হতে পারে তার নিজের অজান্তেই। মনে মনে সে বিড়বিড় করছিল— হে দিন দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্, হে করুণাময় খোদাতালা! হে দীনবন্ধু কৃষ্ণ, তোমাদের রহমত বর্ষিত হোক আমার বেগুনা মানুষটার ওপর। দয়া করো ঠাকুর, নেশার হাত থেকে রক্ষা কোরো ওকে।